অরণ্যে

(গল্পগ্রন্থ – তালনবমী)

বেশি দিনের কথা নয়, গত ফাল্গুন মাসের কথা। দোলের ছুটিতে গালুডি বেড়াতে গিয়েছিলাম।প্রসঙ্গক্রমে বলি যে সিংভূম জেলার এই অঞ্চলে আমি অনেকবার গিয়েচি এবং এখানে আমার কয়েকটি বন্ধু বাড়িও করেচেন, ছুটি-ছাটাতে গিয়ে কিছুদিন যাপন করবার জন্যে।

গালুডি ক্ষুদ্র গ্রাম, এ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে দূরে সব দিকেই পাহাড়ের শ্রেণী ওজঙ্গল। দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখার ওপারে সিদ্ধেশ্বর ও ধনঝরি শৈলমালা, তার ওদিকেতামাপাহাড় নামে একটি অনুচ্চ পাহাড়, এখানে কয়েক বৎসর পূর্বে একটা তামার খনি ছিল, কোম্পানি ফেল হয়ে যাওয়াতে ঘর, বাড়ি, কারখানা, চিমনি, ম্যানেজারের বাংলো সবই পড়েআছে, মানুষজন নেই। জায়গাটার নাম রাখা মাইন্‌স্। এই নামে একটা ছোট রেলস্টেশনও আছে দেড় মাইল দূরে। রাখা মাইন্‌স্ এবং তার আশেপাশে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়, মাঝেসাঁওতালী বন্য গ্রাম। এই সব বনে হস্তী আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে, ভালুক তো আছেই। এইজঙ্গলে যখন-তখন চলাফেরা করা বিপজ্জনক, বন্দুক না নিয়ে কখনো যাওয়া উচিত নয়।

এই পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে একটা ভগ্নপ্রায় খড়ের বাংলোতে এক মাদ্রাজী কবিরাজথাকতেন, তার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল। তার মুখে গল্প শুনেচি—কিছুদিন আগে দুই বুনোহাতির লড়াই হয়েছিল পুরোনো কারখানার কাছে। দু'দিন ধরে লড়াই হয়, শেষকালে একটা হাতিমারা যায়। বেশি রাত্রে তার বাংলার বারান্দায় বাঘ ডাকে, সম্পূর্ণ দিনের আলো না ফুটলেতিনি কখনো বাংলোর বারান্দার দিকের দোর খোলেন না।

আমি ইতিপূর্বে অনেকবার যখন গালুডি গিয়েচি, তখন রাখা মাইন্‌স্ ও তার আশেপাশের বনে বেড়াতে গিয়েচি একা একা। একা যাওয়ার কারণ, প্রথমত তো ওসব বনের মধ্যেস্বাস্থ্যান্বেষী অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত শৌখিন কলকাতার বাবুরা পায়ে হেঁটে যেতে রাজী হন না, দ্বিতীয়ত গভীর বনের মধ্যে বেড়ানোর শখও সবার থাকে না—এতে তাদের দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অনেকবার বেড়িয়ে বনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা পরিচিত হয়ে গিয়েচিল। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয় তখন লোকে স্বভাবতই সেখানে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ে। আমিও তাই হয়েচিলাম; ওদেশে বনে বেড়াতে হলে সাধারণত সকালের দিকে যাওয়াই নিয়ম, বেলাদু'টো-তিনটের পর অর্থাৎ পড়ন্ত বেলার দিকে বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে লোকালয়ের দিকে আসাই ভাল।

প্রথম প্রথম এ-নিয়ম খুবই মেনে এসেচি। একজন করে সাঁওতাল গাইড সঙ্গে না নিয়েবনে যেতাম না। একবার সিদ্ধেশ্বরডুংরি বলে প্রায় পনেরো শ' ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম, সেবারও সঙ্গে ছিল একজন সাঁওতাল ছোকরা। পাহাড়ের ওপর অনেক উঁচুতেবুনো হাতিতে চারা কেঁদগাছ ভেঙে দিয়েছে, সেই পথপ্রদর্শক সাঁওতাল ছোকরা আমায় দেখায়।চীহড় ফল,—একরকম বুনো সীমের মতো ফল, তার বীজ পুড়িয়ে খেতে ঠিক গোলআলুরমতো—সে-ই পুড়িয়ে খাইয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। পাহাড়েরএক জায়গায় একটি গুহা দেখিয়ে বলেছিল, এ গুহা এখান থেকে সুবর্ণরেখার ওপার পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

এ-সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। যাঁরা ঘন অরণ্যানী, নির্জন শৈলমালারসৌন্দর্য ভালবাসেন তাদের এ সব স্থানে আসা দরকার। বনের মধ্যে মাঝে ক্ষীণকায়া পার্বত্যনদী—হয়তো হাঁটুখানেক জল ঝিরঝির করে বইচে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে। দু'ধারেই জনহীন বনভূমি, কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল, ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ। কত বিচিত্র বন্যপুষ্প, বন্য শেফালির বন। বার বার যাতায়াত করতে করতে ভয় ভেঙে গেল। যখন নিজের চোখে কখনো ভালুক দেখলাম না বুনো হাতির তাড়া সহ্য করতে হল না, তখন মনে হল অনর্থক কেন একজন গাইড নিয়ে গিয়ে পয়সা খরচ করা! যেতে হয় একাই যাব।

অর্থব্যয় ছাড়া গাইড নিয়ে ঘোরার অন্য অসুবিধাও ছিল। ধরুন, এক জায়গায় চমৎকারবন্য-পুষ্পের শোভা, পাহাড়ের নীল চূড়া সুনীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নিকটেই ক্ষুদ্রপার্বত্য ঝরনার মৃদুকলধ্বনি, বনস্পতিদের শাখায় শাখায় বন্য পক্ষীর কূজন,—আমার মনে হলএখানে অদূরবর্তী শিলাখণ্ডে পিয়াল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি, আপনমনে প্রকৃতির এই নিরালা রাজ্যে বসে বনবিহগ-কাকলী শুনি; কিন্তু গাইড

দু'দণ্ড স্থির হয়েবসতে দেবে না, বলবে, "চলো বাবুজী চলো, এখনো অনেক পথ বাকি।"—তা ছাড়া সঙ্গে লোক থাকলে মনের সে শান্ত, সমাহিত ভাবও আসে না।

এই সব কারণে ইদানীং একাই বেড়াতে যেতাম বনের মধ্যে। কিন্তু যে ঘটনার কথাএখানে বলব, তার পূর্বে সুবর্ণরেখার ওপারে দু'তিন মাইল ছাড়া একা খুব বেশি দূরে যাইনি, বড়জোর গিয়েচি সিদ্ধেশ্বর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত। গিয়েচি আবার বেলা পড়বারঅনেক আগেই সুবর্ণরেখার তীরে ফিরে এসেচি।

দোলের ছুটিতে এবার গালুডি গিয়ে দেখি অপূর্ব নির্মেঘ নীল আকাশ। বনে বনেশাল-মঞ্জরীর সুগন্ধ, নব বসন্তে নতুন কচি-পাতা-ওঠা শাল, কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া, গাছে গাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েচে। বসন্তের বন্যা এসেচে পাহাড়ি ঝরনার মতো নেমে—বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্রসজ্জায় বনে বনে।

একজন বৃদ্ধ সাঁওতালের মুখে শুনেছিলাম, পাঁচ মাইল দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায়একটা ছোটখাট জলপ্রপাত আছে—জায়গাটার নাম নিশিঝরনা। সেখানে নাকি বন আরো ঘন, পথে এক জায়গায় পুরোনো আমলের একটা দেউল আছে ইত্যাদি। জায়গাটা দেখবার খুব ইচ্ছেহল। দোলের আগের দিন বেলা দশটার মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে জায়গাটার উদ্দেশে বার হয়েপড়লাম।

শীঘ্রই সুবর্ণরেখা পার হয়ে গিয়ে রাখা মাইন্‌স্‌-এর পথ ধরলাম। মুসাবনী রোড যেখানেরাখা মাইন্‌স্‌-এর চার নম্বর শ্যাফটের গভীর বনের মধ্যে গালুডির পাকা রাস্তার সঙ্গেমিশেচে—সেখানে পৌঁছতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। তারপর বাঁধা সড়কছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকে কুলামাড়ৌ বলে একটা ক্ষুদ্র বন্যগ্রাম পার হয়ে পায়েচলা সুঁড়িপথ ধরেধনঝরি পাহাড়ের নিচেকার ঘন বনের মধ্যে ঢুকলাম। পথ যে আমার একেবারে অপরিচিত তা নয়, আর বেশিদূর অগ্রসর না হলেও কুলামাড়ৌ গ্রামে সাঁওতালী উৎসবে সাঁওতালী নৃত্যদেখতে এর আগেও একবার এসেচি। সুতরাং আমার মনে দ্বিধা বা ভয় থাকবার কথা নয়, ছিলও না।

কুলামাড়ৌ পেছনে ফেলে এসেচি, আমার ডাইনে ধনঝরি পাহাড় সরু বন্য পথেরসমান্তরাল ভাবে যেন বরাবর চলেচে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে। বনক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে তা বেশ লক্ষ্য করচি। কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিক থেকেও আর একটা শৈলশ্রেণী যেন ক্রমশ ধনঝরির গায়ে মেশবার চেষ্টা করছে। যে অরণ্যাবৃত উপত্যকাদিয়ে আমি চলেছি সেটা যেন ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। আমার জানা ছিল এই পথটা বনেরমধ্যে দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ধনঝরি পাহাড় পার হয়ে ওপারে চলে গিয়ে আবার মুসাবনীরোডের সঙ্গে মিশেছে। সুতরাং মনে কোনো উদ্বেগ ছিল না। জানি যেতে যেতেআপনা-আপনি মুসাবনী রোডে পড়বই। নিশিঝরনা কোথায় আমার জানা ছিল না; আমি বনের মধ্যে যেতে যেতে কান খাড়া করে আছি কোথায় ঝরনার শব্দ পাওয়া যায়। এক জায়গায় সত্যিই শব্দ পাওয়া গেল জলের। সুঁড়িপথটা ছেড়ে নিবিড়তর বনের মধ্যে ঢুকে দেখি একটিক্ষুদ্র পার্বত্য নদী উপলরাশির উপর দিয়ে বয়ে চলেচে; তার দু'ধারে এক প্রকার বন্যগাছ—অজস্র বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে। স্থানটি যেমন সুন্দর তেমনি স্নিগ্ধ, কতক্ষণ বসেরইলাম একটা শিলাখণ্ডে, উঠতে যেন ইচ্ছে করে না।

কিন্তু এই বনে থাকা তখন যে উচিত ছিল না, তা তখন বুঝিনি। প্রথমত তো বনের ওসব নিভৃত স্থানে বিশেষ করে যেখানে জল থাকে, সেখানে বাঘ থাকা বিচিত্র নয়, দ্বিতীয়তবেলা গেল, পথ তখনো কত বাকি সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না—অথবা ধারণা থাকলেও ভুল ধারণা ছিল। যখন আবার সুঁড়িপথটায় উঠলাম তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে।

বনের এই অংশের শোভা অবর্ণনীয়। প্রথম বসন্তে কত কি বনের ফুল গাছের মাথাআলো করে রেখেচে, ধনঝরির নীল সানুদেশ এক দিকে খাড়া হয়ে উঠেছে ডাইনে, শালমঞ্জরীরসুবাসে উপত্যকার বাতাস নিবিড় হয়ে উঠেচে, বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে গন্ধটি যেন আরও বাড়চে; কতক্ষণ অন্যমনে চলেছি, সুঁড়িপথটাও কখন হারিয়ে গেচে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখি আমার সামনেই ধনঝরি পাহাড়ের খুব উঁচু একটি অংশ, সেখানে পাড় টপকে ওপারে যাওয়ার কোনো উপায় নেই—পথও নেই। স্থানটি সম্পূর্ণ জনমানবহীন। সেই কুলামাড়ৌ গ্রাম ছাড়িয়েএসে আর লোকালয় চোখে পড়েনি। বেলাও পড়েচে, একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তা

ছাড়াসুঁড়িপথটাই বা গেল কোথায়? বনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পথ খুঁজতে গিয়ে আরো গভীর বনেরমধ্যে ঢুকে গেলাম।

এদিকে সূর্য হেলে পড়েছে। এ বনের মধ্যে আর বেশিক্ষণ দেরি করা উচিত হবে না। ভাবলাম, আর নিশিঝরনা দেখে দরকার নেই, এবার যে পথে এসেচি সেই পথেই ফিরি। কিন্তুকোথায় সে পথ? ক্রমে এমন সব জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখান দিয়ে আসবার সময় আসিনি তা বেশ বুঝলাম। বনের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া খুব সহজ, বিশেষ করে এ ধরনের নিবিড় বনের মধ্যে। কিন্তু আমি জানি ধনঝরি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণেরদিকে বিস্তৃত, বিশেষত সূর্য যখন এখনো আকাশে দেখা যাচ্ছে, তখন দিক-ভুলের সম্ভাবনাঅন্তত নেই—এই একটা ভরসা ছিল মনে। কিন্তু ভরসা ভরসাই রয়ে গেল সেই পর্যন্ত, কোনো কাজে এল না। সূর্য ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল। ছায়া ঘনিয়ে এল বনে। যদিও সামনেজ্যোৎস্নারাত্রি, তবুও এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা রাত্রি কাটানোর সম্ভাবনায় বিশেষ পুলকিতহয়ে উঠলাম না।

হঠাৎ মনে হল ধনঝরি পাহাড়ের ওপারেই তো মুসাবনী রোড। পাহাড়টা যদি কোনো রকমে টপকাতে পারি, এখনো রাত হয়নি, লোকালয়ে পৌঁছতে পারব। নতুবা ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে যতই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরব ততই সম্পূর্ণরূপে পথভ্রান্ত হয়ে পড়তেহবে। একটা জায়গায় মনে হল যেন ধনঝরি একটু নিচু হয়েছে। এই ধরনের নিচু খাঁজ দিয়েইআমার জানা পায়ে-চলার সুঁড়িপথটা গেচে—ঘন চুলের মধ্যে মধ্যে চেরা সিঁথির মতো; পার্বত্যপথের কোনো চিহ্নই দেখছি না কোনো দিকে, তবুও এই অপেক্ষাকৃত নিচু থাক টপকে ধনঝরিরওপারে যাওয়া খুব কঠিন হবে না মনে হয়।

জুতো খুলে হাতে নিলাম। পাহাড়ের কিছুদূর উঠে গিয়ে দেখি, নিচে বনের মধ্যে যত অন্ধকার ওপরে ততটা নয়। জ্যোৎস্না উঠল, জ্যোৎস্না ফুটবে ভাল। প্রথম খানিকটাউঠেই মনেহল ভুল জায়গা দিয়ে পাহাড় পার হচ্ছি, এখান দিয়ে কখনো কেউ পাহাড় পার হয়নি—যেমনবড় বড় পাথরের চাই, তেমনি কাঁটা গাছ সর্বত্র। খালি পায়ে ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে বিষম কষ্ট, অথচ জুতো পায়ে দেওয়াও চলে না।

পাহাড়ের ওপরে খানিকটা উঠে গেলাম দিব্যি। তারপরে এক জায়গায় গিয়ে দেখিসামনে একেবারে খাড়াই—দুরারোহ পাহাড় দেওয়ালের মতো উঠেছে। বড় বড় গাছের শেকড় ঝুলচে, যেন জলের তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে পড়েছে। আমি শিক্ষিত পর্বতারোহণকারী নই, সেই খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি একদিকে একটা মসৃণ প্রকাণ্ড শিলা আড়ভাবে শোয়ানো, সেখানা উচ্চতায় আন্দাজ কুড়ি-বাইশ হাত এবং চওড়ায় ত্রিশ-বত্রিশ হাত হবে। এ ধরনেরপাথরকে এদেশে ‘রাগ’ বলে।‘রাগ’ পার হওয়া বিপজ্জনক, কারণ হাত-পা দিয়ে ধরবার এতেকিছু থাকে না। তবে এখানা অন্তত ৬০°ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে বলে ভরসা হল; এইএকমাত্র পথে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠা চলবে এখন।

জুতো যখন পায়ে নেই, এক রকম করে চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ‘রাগ’ পার হয়েওপরে উঠলাম। তারপরে ওঠার বিশেষ কষ্ট নেই, শুধু অর্জুন আর শুভ্র নিষ্পত্র শিববৃক্ষেরজঙ্গল, বাঁকাভাবে চাঁদের আলো এসে শিববৃক্ষের দুধের মতো সাদা ধবধবে গুঁড়ির গায়েপড়েচে। কারণ তখন প্রদোষের ঈষৎ অন্ধকার কেটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। এক জায়গায়ওপরদিকে মনে হল যেন গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্চে। কৌতূহল হল অত্যন্ত, আপনি-আপনি গাছে কি করে আগুন লাগবে? ওপরে উঠে গিয়ে দেখি, সত্যিই এক জায়গায়একটা মোটা শেকড়ের গা দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে—তবে কি ভাবে শেকড়ে আগুন লাগল তা আজও বলতে পারি না।

তখন আমি অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েচি, নিম্নের উপত্যকার গাছপালার মাথাকোঁকড়াচুল কাফ্রিদের মাথার মতো দেখাচ্ছে; চাঁদের আলো বনের নিবিড় অন্ধকার উপত্যকারমধ্যে এতটুকুঢোকেনি, ওপর থেকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছিসেখানে চারিদিকে ধনঝরির বিভিন্ন চূড়ার বনরাজির মাথায় মাথায় শুভ্র ঢেউ। সে জনমানবহীন শৈলমালার ঊর্ধ্ব সানুতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত শুক্লা চতুর্দশী রাত্রির শোভা যে দেখেনি তাকে বলেবোঝানো যাবে না সে কি অপূর্ব ব্যাপার! একা যেন আমি পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোন্ দেবলোকে

বিচরণশীল আত্মা, আমার চোখের সম্মুখেযে দৃশ্য দূর থেকে সুদূরে প্রসারিত, কোনো পার্থিবচক্ষু কোনোদিন তা দর্শন করেনি। কিন্তু সেখান থেকে আমার মনে হল আমি সম্পূর্ণ ভুলকরেচি, যে দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠেচি সেখান দিয়ে পাহাড় টপকাবার উপায় নেই—যতই উঠিততই দেখি আমার চোখের সামনে অর্জুন ও শিববৃক্ষের সাদা সাদা সোজা গুঁড়িগুলো থাকেথাকে উঠে যেন স্বর্গে উঠেছে। অর্থাৎ পাহাড়ের শিখরদেশের তখনো পর্যন্ত কোনো পাত্তাই নেই। তাছাড়া ক্লান্তও খুব হয়ে পড়েচি। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছেঅতিরিক্ত শ্রমের ফলে। এই বন ভেঙে অতখানি উঠে ওপারের ঢালু দিয়ে নামতে পারব বলে।মনে হল না—তার চেয়ে যে পথে উঠেচি, হাত-পা ভেঙে মরার চেয়ে নিম্ন উপত্যকায় নেমেজ্যোৎস্নার আলোয় আবার না হয় পথ খুঁজি। বিপদ এল এতক্ষণে এই নামবার সময়, সম্পূর্ণঅপ্রত্যাশিত ভাবে; একেবারে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হল প্রায়। দুর্ঘটনা যখন আসে তখন এমনি অতর্কিতে আসে।

যতটা উঠেছিলাম জ্যোৎস্নার আলোতে, একরকম করে নেমে এসে সেই 'রাগ' খানারকাছে পৌঁছলাম। রাগ পার হয়ে নেমে গেলে উপত্যকা আর বেশি নিচে নয়।

'রাগ' বেয়েই নামতে হবে, কারণ অন্য দিকে নামবার কোনো উপায় নেই। অথচ 'রাগ'এমন মসৃণ যে হাতপায়ে আঁকড়াবার কিছু নেই—এ ধরনের পাথর বেয়ে ওঠা বরং সহজ, কিন্তুনামা অত্যন্ত কঠিন। তাড়াতাড়িতে আর একটা ভুল করলাম, উপুড় হয়ে না নেমে চিৎ হয়েনামতে গেলাম। যাই হোক, খানিকটা তো নামলাম দিব্যি, তারপর পাথরখানার ওপর দিকের যে প্রান্ত হাত দিয়ে ধরেছি সেটা ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সড়সড় করে খানিকটা নামলাম। তারপর পাথরের গায়ে এক জায়গায় একরাশ শুকনো পাতা জমে আছে—সেখানটিতে পাথরেরকোনো খাঁজ আছে ভেবে যেমন পা নামিয়ে দিয়েছি অমনি শুকনো পাতার রাশ হড়হড় করেসরে গেল—সেই ঝোঁকে আমিও খানিকটা গড়িয়ে পড়লাম। অথচ পায়ে আটকাবার কোনো খাজ বা উঁচু-নিচু জায়গা কিছুই পেলাম না।

তখন আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। কোথাও কিছু করবার নেই—স্লেটের মতোমসৃণ পাথরখানার কোনো জায়গায় আমি চিৎ হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তার ওপর শুয়েআছি এবং আঙ্গুল টিপে বা সামান্য কিছু ধরে আছি, সেটা ছেড়ে দিলেই নিচের দিকে গড়িয়ে পাথরের নুড়ির স্তূপের ওপর গিয়ে পড়ব। সে পাথরের স্তূপ অন্তত ত্রিশ ফুট নিচে, তার ওপরপড়লে তীক্ষ্ণ ধারালো অসমান প্রস্তরখণ্ডে বিষম আহত হতে হবে। তারপর হাত-পা ভেঙে পড়েথাকলে এ জনশূন্য পাহাড়ের ওপরে কে-ই-বা উদ্ধার করচে? এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটা বিচিত্র কি?

যখন আমি বুঝলাম আমি খুব বিপদগ্রস্ত, তখন হাত-পায়ে যেন আর বল নেই। আঙুলেটিপে ধরব কি, আঙুলই অবশ হয়ে আসছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ কাটলেই গড়িয়ে নিচে পড়েযাব এবং সাংঘাতিক আহত হব।—তখন মনে হল ওঠবার সময় পাথরখানার এ অংশ দিয়েউঠিনি, কোণ ঘেঁষে উঠেছিলাম—সেখানে নিচে ছোটবড় অসমান শিলাখণ্ডের ধাপমতো ছিল, তখন দিনের আলো ছিল বলে দেখেশুনে ওঠবার সুবিধা ছিল, এখন রাত্রে বিশেষ করে ওপরের দিক থেকে নামবার সময় অতটা বুঝতে পারিনি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে চাইলাম, জলে ডোবার পূর্ব মুহূর্তে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোনো আশ্রয় খোঁজে, তেমনি। হঠাৎ নজরে পড়ল হাতখানেক দূরে একটা অর্জুন গাছের মোটাশেকড় ওপরের একখানা শিলাখণ্ডের ফাটল থেকে বার হয়ে ঝুলচে। মরিয়ার মতো সাহসেঝোঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেই শেকড়টি আঁকড়ে ধরতে গেলাম এবং ধরেও ফেললাম। এতেনিজেকে আরো বিপন্ন করেছিলাম—কারণ শেকড় হাতের নাগালে না এলে টাল খেয়ে পড়েগিয়ে সজোরে নিচের প্রস্তররাশির উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যেতাম— ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়লেহয়তো চোট খেয়ে বেঁচে যেতাম, এতে কিন্তু বাঁচবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

'রাগ' থেকে শেকড় ধরে নেমে এসে সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঝাল বেরুচ্ছে বলে মনেহল—নিশ্চিত দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে যেমন হয় মানুষের। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রামকরে নিয়ে হাত-পায়ের অবশ ভাবটা

কাটিয়ে আবার নামতে আরম্ভ করলাম এবং পনেরোমিনিটের মধ্যেই ধনঝরির উপত্যকার সমতলভূমিতে পা দিলাম।

তখন আমার মনে সাহস বেড়ে গিয়েছে। গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েসমতলভূমিতে কোনো বিপদই আর আমার কাছে বিপদ নয়। তখন রাত আন্দাজ দশটা হবে মনে হল। জ্যোৎস্না খুব ফুটেছে, বনের মধ্যে আগের মতো অত অন্ধকার নেই। প্রথমে সেইপার্বত্য নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম তার জলের কলধ্বনি শুনে। জল পান করে ও মাথায় মুখেজল দিয়ে শরীর ও মনসুস্থ হল। মনে তখন ভয় বা উদ্বেগ আদৌ নেই। সুতরাং ধীর মস্তিষ্কনিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সেই সুঁড়িপথটা প্রায় আধঘণ্টা পরে বার করলাম।

কুলামাড়ৌ যখন এসে পৌঁছেচি তখন রাত বারোটার কম নয়। গ্রাম নিষুতি হয়ে গেচেবহুক্ষণ, আমায় দেখে গ্রাম্য কুকুরের দল মহা ঘেউঘেউ শুরু করলে। একটা ঘরের দাওয়ায় লোকেরা শুয়েছিল, কুকুরের ডাক শুনে তারা জাগল। আমায় দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় বনের মধ্যে যেতে দেখেছিল দুপুরের পরে—বললে, "খুব বেঁচে গিয়েছিস বাবু! শঙ্খচূড় সাপের সামনে পড়লে আর বাঁচতিস না! ধনঝরির বনে বড় শঙ্খচূড় সাপের ভয়।"

রাতটা সে গ্রামে কাটিয়ে সকালের দিকে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডিতে ফিরে এলাম।